রাসূলের (সা) যুগে মদীনার সমাজ

মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

(২য় খন্ড)

ড: আকরাম জিয়া আল উমরী

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

রাসূলের (সা) যুগে মদীনার সমাজ

মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

(২য় খণ্ড)

ডঃ আকরাম জিয়া আল উমরি

অনুবাদ
এম রুহুল আমিন

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট

রাসূলের (সা) যুগে মদীনার সমাজ

মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

(২য় খণ্ড)

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থ্যট (বিআইআইটি)
বাড়ি # ৫০, রোড # ১৬, (৩য় তলা), ধানমন্ডি আ/এ
ঢাকা -১২০৯
ফ্যাক্স : ৮৮০-২-৯১১৪৭১৬,
ফোন : ৯১৩৮৩৬৭, ৮১২২৬৭৭, ০১৫৫৪৩৫৭০৬৬
E-mail : biit_org@yahoo.com

প্রথম প্রকাশ
শ্রাবণ ১৬, ১৪১৪ বঙ্গাব্দ
জুলাই ৩১, ২০০৭ খ্রিষ্টাব্দ

ISBN : 984-8203-51-2

প্রচ্ছদ
নজরুল ইসলাম বাদল

বিনিময় ঃ ১৭০.০০ টাকা

মুদ্রণ ঃ
চৌকস প্রিন্টার্স লিমিটেড
১৩১ ডিআইটি এক্সটেনশন রোড
ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০

Rasuler (sm) Jooge Madinar Samaj is a Bengali translation of Medinan Society at the Time of the Prophet- Zihad against the Mushriks vol. 2 by Akram Diya al Umari and translated into Bengali by M Ruhul Amin and published by Bangladesh Institute of Islamic Thought, Dhaka, Bangladesh, 1st Print 2007.
Phone : 9138367, 8122677, Fax : 9114716, Email : biit_org@yahoo.com
Price : Tk. 170.00, US$ 12.00

সূচিপত্র

ভূমিকা vii

অধ্যায় ১

জিহাদের বিধান ১৭

অধ্যায় ২

জিহাদের শুরু ২২

অধ্যায় ৩

কিবলা পরিবর্তন ২৬

অধ্যায় ৪

বদরের মহা অভিযান ৩০

অধ্যায় ৫

ওহুদের যুদ্ধ ৫৩

অধ্যা য় ৬

বানু মুস্তালিকের অভিযান (আল মুরাইসি) ৭৯

অধ্যায় ৭

খন্দকের যুদ্ধ (আল আহযাব) ৯২

অধ্যায় ৮

হুদায়বিয়া অভিযান ১০৮

অধ্যায় ৯

রাজা ও শাসকদের কাছে রাসূল (সা)-এর পত্র ১২৯

অধ্যায় ১০

বেদুঈনদের শৃঙ্খলাকরণ ১৩৬

অধ্যায় ১১

ক্বাযা উমরাহ ১৩৮

অধ্যায় ১২
মু'তা অভিযান ১৪০

অধ্যায় ১৩
যাত আল সালাসিল অভিযান ১৪৪

অধ্যায় ১৪
মক্কা বিজয় ১৪৬

অধ্যায় ১৫
হুনাইনের যুদ্ধ ১৬৩

অধ্যায় ১৬
তায়েফ অভিযান ১৮১

অধ্যায় ১৭
তাবুক অভিযান ১৯৭

অধ্যায় ১৮
প্রতিনিধিদের বছর ২১৪

অধ্যায় ১৯
আবু বকরের নেতৃত্বে হাজ্জ ২১৮

অধ্যায় ২০
বিদায় হাজ্জ ২২১

অধ্যায় ২১
উসামা ইবনে যাইদ ইবনে হারিসার বাহিনীকে অস্ত্রসজ্জিতকরণ ২২৪

অধ্যায় ২২
রাসূল (সা)-এর ইন্তেকাল ২২৫

কুরআনের আয়াতের পরিশিষ্ট

অধ্যায় ১

জিহাদের বিধান

জিহাদ একটি ইসলামী বিধান। আল্লাহর *শরীয়া* প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহর পথে যুদ্ধের নামই *জিহাদ*। ইসলামের লক্ষ্য অর্জনই *জিহাদের* উদ্দেশ্য। রাসূল (সা)-এর মক্কী যামানায় *জিহাদ*-এর বিধান চালু হয়নি। তখনো *মুশরিকদের* বিরোধিতা করা বা তাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণের জন্য বলা হয়নি। তখন মুসলিমদের জন্য এ পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় ঃ

> ...তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, *সালাত* কায়েম কর এবং *যাকাত* দাও। (৪ ঃ৭৭)

ইসলাম প্রচারের মিশন যখন নতুন অবস্থায় তখন মুসলিমগণ এ পদ্ধতি অবলম্বন করে। চারাগাছ যেমন তার পুষ্টি ও মযবুত শিকড় গজানো ও পরিবেশের মোকাবেলার জন্য পানির প্রয়োজন অনুভব করে তেমনি ইসলামের প্রথম যুগে মুসলিমগণ এরূপ পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ঐ সময়ে তারা তলোয়ার দিয়ে *মুশরিকদের* মোকাবেলা করলে *মুশরিকরা* ইসলামকে প্রথম অবস্থাতেই সমূলে ধ্বংস করে দিত।

মুসলিমগণ ঐ মুর্হূতে বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছিল। তারা তখন ধৈর্যের সাথে *মুশরিকদের* নির্যাতন সহ্য করে তাদের প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যান, আর আল্লাহর বন্দেগীর মাধ্যমে তাদের ঈমানের শক্তি বাড়াতে থাকেন। নিজেদের *নফসের* বিরুদ্ধে লড়াই করে যেতে থাকেন আর অন্যদেরকে ইসলামের *দাওয়াত* দিতে থাকেন এবং তাদের সংখ্যা বাড়াতে থাকে। ঐ সময়ে *মুশরিকদের* তুলনায় মুসলিমদের সংখ্যা এতই নগণ্য ছিল যে, ইসলাম কবুল করার সাথে সাথে একই বিশ্বাসের মানুষদের সাথে মিশতে পারার কোন সুযোগ তাদের ছিল না। এ সময়ে তারা ইসলামের শিক্ষা গ্রহণে *দার-আল-আরকাম* ও অন্যান্য স্থানে মিলিত হতেন। ঐসময়ে *জিহাদকে* আবশ্যকীয় করা হলে তখন ইসলাম কবুলকারীদের সাথে প্রতি ঘরে ঘরে লড়াই বেধে যেত। মুসলিমগণ মদীনায় হিজরত করলে *আনসারগণ* তাদেরকে সমর্থন করেন। এভাবে দারা তাদের অধীনে একটি ভূ-খন্ডের মালিক হন। তখন মুসলিমদেরকে আল্লাহ *জিহাদ* করার নির্দেশ দেন। প্রথমে নিজেদের রক্ষার্থেই *জিহাদের* অনুমতি দেয়া হয়।

> যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল তাদেরকে যারা আক্রান্ত হয়েছে। কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করতে সম্যক সমর্থ। (২২ ঃ ৩৯)

এরপর আত্মরক্ষাও তাদের ঈমান রক্ষার্থে মুসলিমদেরকে লড়াইয়ের অনুমতি দেয়া হয়।

> যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরাও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর। কিন্তু সীমা লংঘন করো না। আল্লাহ সীমা লংঘনকারীকে ভালবাসেন না। (২ ঃ ১৯০)[১]

এটা ছিল *জিহাদের* বিধানের দ্বিতীয় পর্যায়। মানব সমাজের যুদ্ধ বিগ্রহের মধ্যে এসবের বিবেচনায় *জিহাদ* ভিন্নতর। কোন ব্যক্তি বা জনগোষ্ঠির জন্য এ *জিহাদ* রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে নিয়োজিত।

যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না (২৮ ঃ ৮৩) তাদের *জিহাদের* লক্ষ্য সত্যের বাধ্যবাধকতা, ন্যায় বিচার ও দয়া প্রদর্শনের শর্তে *জিহাদকে* অন্যান্য সকল যুদ্ধ থেকে আলাদা করে দিয়েছে। আল্লাহর কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

> "যারা মু'মিন তারা আল্লাহর পথে সংগ্রাম করে এবং যারা *কাফির* তারা সংগ্রাম করে তাগুতের পথে; সুতরাং তোমরা শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম কর; শয়তানের কৌশল অবশ্যই দুর্বল।" (৪ ঃ ৭৬)

এ ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেন -

> আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে লড়াই কর, সামরিক অভিযানে অংশ গ্রহণ কর তবে লুণ্ঠনে শরীক হইয়ো না। তোমরা শপথ ভংগ করো না, বা কারো অংগহানি বা শিশু হত্যা করো না।[২]

এরপর আসে তৃতীয় পর্যায়। মুসলিমদেরকে এ সময়ে *মুশরিকদের* বিরুদ্ধে লড়াই করতে নির্দেশ করা হয়েছে, ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে মুসলিমদের সকল বাধা দূর করে দুনিয়ায় সুযোগ করে নেয়ার জন্য লড়াইয়ের অনুমতি দেয়া হয়েছে। *মুশরিকরা* যাতে মুসলিমদেরকে কোন অত্যাচার করতে না পারে বা তাদের ঈমান গ্রহণে কোন সমস্যার সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য তাদেরকে *মুশরিকদের* বিরুদ্ধে লড়াই করতে অনুমতি দেয়া হয়েছে ঃ

> এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে থাকবে যতক্ষণ না *ফিতনা* দুরীভূত হয় এবং আল্লাহর দ্বীন সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং যদি তারা বিরত হয় তবে তারা যা করে আল্লাহ তার সম্যক দ্রষ্টা। (৮ ঃ ৩৯)
>
> "তোমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান দেয়া হলো যদিও তোমাদের নিকট ইহা অপ্রিয়; কিন্তু তোমরা যা পছন্দ কর না সম্ভবত তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর এবং যা পছন্দ কর সম্ভবত: তা তোমাদের জন্য অকল্যাণকর। (২ ঃ ২১৬)
>
> যাদের প্রতি কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে তাদের মধ্যে যারা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনে না ও পরকালেও নয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা নিষিদ্ধ করেছেন তা নিষিদ্ধ করে না এবং সত্য দ্বীন অনুসরণ করে না তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়ে স্বহস্তে *জিযয়া* দেয়। (১০ ঃ ২৯)

জিহাদ ইসলামের অতি গুরুত্বপূর্ণ ফরয। *জিহাদের* মাধ্যমে মুসলিমগণ তাদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে। এর মাধ্যমে দুনিয়ার সর্বত্র তারা ইসলাম কবুলের স্বাধীনতা অর্জন করে। ইসলামের প্রসারে তাদের রাজনৈতিক ও সামরিক আধিপত্য অর্জন করে আর নিজেদের রক্ষায় কার্যকর পন্থা অবলম্বন করে। বল প্রয়োগে ব্যক্তি পর্যায়ে ইসলাম কবুল করানো সম্ভব নয়।

ইসলামে কোন জোরজবরদস্তি নেই। (২ ঃ ২৫৬)

ইসলাম প্রচারের লক্ষ্যে ইসলামকে সংহত করতে হবে এবং দুনিয়াব্যাপী এর সমর্থনকারীদেরকে রক্ষা করতে হবে। ইসলামকে দুনিয়ার সব রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তির ওপর শ্রেষ্ঠ করে গড়ে তুলতে হবে। চৌদ্দশত বছরপূর্বে যেখানে ইসলাম প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল সেখানে ইসলামের অবদানকে সংহত করে তুলতে হবে। ঐ সময়ে দেশের সরকার জনগণকে ইসলাম কবুলে নিষেধ করতো। মক্কার কুরাইশগণ মুসলিমদেরকে নির্যাতন করত। পার্সীয়ান ও বায়জেন্টাইনের মানুষেরাও এদের ওপর নির্যাতন চালায়। আরব উপদ্বীপে সিরিয়া ও মিশর সীমান্তের লোকজন এরূপ অত্যাচার চালাতো। কুরআনে এটা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, *জিহাদের* বিষয়টি কোন সামরিক বিষয় নয়। রাসূল (সা)-এর *হাদীস* অনুযায়ী মুসলমানদের জন্য এটা ফরজ।

> পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত *জিহাদ* মুসলিমদের জন্য বাধ্যতামূলক। যে মৃত্যুবরণ করলো অথচ আল্লাহর রাস্তায় *জিহাদ* করলো না বা *জিহাদের* জন্য কোন সংকল্পও ব্যক্ত করলো না সে যেন *মুনাফিক* হিসাবে মৃত্যুবরণ করলো।[৩]

ফিকহের গ্রন্থে *জিহাদের* বিস্তারিত আলোচনা স্থান পেয়েছে। *জিহাদের* বিভিন্ন বিধি-বিধানের আলোচনা করা হয়েছে। *সালাত, সাওম, হাজ্জ, যাকাতের* ন্যায় বিষয়টি ফিকহ শাস্ত্রে আলোচিত হয়েছে। ইসলামের অন্যান্য রোকনের ন্যায় মুসলিমদের জন্য *জিহাদও* একটি গুরুত্বপূর্ণ রোকন।

জিহাদের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহর সবগুলো গ্রুপ একতাবদ্ধ হয়েছে ও শত্রুর বিরুদ্ধে তাদের শক্তি নিয়োজিত করেছে। মুসলিমদল যেখানেই গিয়েছে সেখানেই তারা মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দেয়ার আহবান জানিয়েছে। আল্লাহর ইবাদত করার দিকে আহবান করেছে, জাতি বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে সমানভাবে সম্মান দেখাতে শিখিয়েছে। ইসলামের সুমহান আদর্শ আর আহবান মানুষের হৃদয় স্পর্শ করেছে। ইসলামের আহবান তলোয়ারকে জয় করেছে। ইসলামের বিজয়ের এটাই রহস্য। এটাই বিজয়ের মূল কারণ।

ইসলামের বিজয় অভিযানের বহু কারণের কথা বলা হয়েছে। দ্রুত ও সফল বিস্তারের বহু কারণের উল্লেখ হয়েছে। ঐতিহাসিক সিতানী ও অন্যান্য পশ্চিমাদের মতে এর কারণ অর্থনৈতিক। তাদের মতে আরব উপদ্বীপে খরা আর আবহাওয়ার ন্যায় বিরূপ পরিবেশের কারণে লোকেরা গরীব এলাকা থেকে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির জন্য সমৃদ্ধশালী এলাকায় দেশান্তরিত হয়। *ফুতাহাত* ছিল এরূপ একটি অভিযান। গবেষণা করলে দেখা যাবে ইসলামের পূর্বে আরব উপদ্বীপে আবহাওয়ার কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এ ছাড়া এ অঞ্চলে তখন কোন অর্থনৈতিক বিপ্লবও ঘটেনি। আরবের লোকেরা ইসলামের পূর্বে এত বিরাট আকারে দেশ ত্যাগ করেনি। ইসলামের আবির্ভাবের কারণেই তারা ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হয় আর ইসলামের নীতি ও আদর্শের অনুসরণ করে। খলিফা ও *ফুতাহাত* নেতাদের মধ্যে বিনিময়কৃত পত্রের মাধ্যমে বুঝা যায় যে, ধর্মীয় বিশ্বাস আর আদর্শই সামরিক বাহিনীর মধ্যে বিশ্বাস ও আদর্শকে সমুন্নত রেখেছে এবং তাদের মধ্যে শৃংখলা প্রতিষ্ঠিত করেছে। যে চেতনা নেতাদেরকে পরিচালিত করেছে, যে মহান আদর্শ সেনাবাহিনীকে পরিচালিত করেছে সে আদর্শই বিশেষ করে বেদুঈনদের মধ্যে ও ইসলামের প্রসার ঘটিয়েছে। এসব সত্ত্বেও *ফুতাহাতের* প্রসার এবং সাধারণ চেতনায়

উদ্বুদ্ধ নেতৃবৃন্দ যে বিষয়ে অভিযানের পরিকল্পনা করেছিলেন তা কোন বেদুঈন যোদ্ধাদের কারো কারো ব্যক্তিগত মনোভাবের কারণে সংগঠিত হয়নি। এ সমাজের নেতৃবৃন্দ তাদের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ও উদগ্রীব ছিলেন, এখানে যুদ্ধে লব্ধ গণিমত তাদের মধ্যে তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

মুক্ত দেশের অধিবাসীদের ওপর থেকে মুসলিম মুক্তিদাতাগণ করভার হ্রাস করেছিল। মুক্তিপ্রাপ্তদের কাছ থেকে তারা কোন সম্পদ দখল করেনি। বিজিত দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে পূর্বাবস্থাতেই রাখা হয়েছিল। গঠনমূলক চেতনার মাধ্যমে তাদের পরিকল্পনা পরিচালিত হয়েছিল।

ইসলামের প্রসারের জন্য রাজনৈতিক উপাদানের ভূমিকাও আছে। রাসূল (সা) ও *খোলাফায়ে রাশেদিন* এ সময় নওমুসলিমদের স্বধর্ম ত্যাগের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁরা মুসলিমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন। এ কাজে তাঁরা তাদের শক্তি ইসলামের কাজে নিয়োজিত করেন। তা না করা হলে ইসলাম প্রচারে সমস্যার সৃষ্টি হতো। পরিস্থিতির এরূপ ব্যাখ্যা ইসলাম প্রচারের জন্য ইতিবাচক হলেও *জিহাদের* বিধানের জন্য এটা ছিল বুদ্ধিদীপ্ত কাজ। তবে ইসলামের প্রসারের জন্য এটা পুরোপুরি কোন উদ্দীপনার কাজ ছিল না। এ সময়ে সবচেয়ে বেশী সমস্যার সৃষ্টি হয় আবুবকর (রা) এর সময়ে বেদুঈন *মুরতাদদের* ইসলাম পরিত্যাগের ফলে। আবুবকর তাদেরকে রাষ্ট্রের অধীনে নিয়ে আসার পর তাদেরকে সামরিক বাহিনীতে যোগদানে নিষেধ করেন এবং শাস্তি স্বরূপ তাদের অস্ত্র কেড়ে নেন। তাদের আনুগত্যের ব্যাপারে এবং তাদের ইসলামী আচরণ ও পরিপূর্ণ ইসলামী ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন বিধায় তাদের ব্যাপারে এরূপ ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। মুক্ত জনপদের মধ্যে এ পরিস্থিতিতে ইসলামের প্রকৃত চিত্র দেখা যেত না। আবু বকর (রা) মদীনা, মক্কা ও তায়েফের লোকজনের ওপর বেশী নির্ভর করতেন। এ স্থানের জনপদে নীতিবোধ ও ইসলামের ওপর প্রজ্ঞা ছিল সুপ্রতিষ্ঠিত। এ সময়ে সেনাবাহিনীর নিমিত্ত *সাহাবীদের* মধ্য হতে নেতা গ্রহণ করা হতো।

এ সময়ে *ফুতাহাতের* পেছনে আরও একটি যুক্তির কথা বলা হয়। *ফুতাহাত* ছিল আত্মরক্ষামূলক। ইসলামী রাষ্ট্রকে তার শক্তিশালী শত্রুদের হাত থেকে রক্ষার জন্য *ফুতাহাতের* প্রয়োজন ছিল। বেশীর ভাগ আরব আর মুসলিম ঐতিহাসিক এ ধারণাই পোষণ করেন। তাদের এ ধারণা ছিল বিংশ শতাব্দীর ধারণার মত, নিন্দনীয় যুদ্ধের আদর্শের ন্যায়, মানব সভ্যতা ধ্বংসকারী কর্মকান্ডের ন্যায়, উদ্বাস্তু সৃষ্টিকারী কর্মকাণ্ডের অনুরূপ। এরূপ কর্মকাণ্ড জাতিসমূহের বিভিন্ন স্বার্থ রক্ষণাবেক্ষণে সৃষ্ট আন্তর্জাতিক সংস্থা সমূহকে জন্য ক্ষতিগ্রস্থ করে। আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ যুদ্ধের বদলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সমস্যার সমাধান করার উদ্যোগ গ্রহণ করে।

ফুতাহাতের ওপর অনেক লোককে *জিহাদের* চেতনায় বর্তমান যামানার প্রেক্ষাপটে নমনীয় মনোভাব গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেছে। পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক কারণই লেখকদের এরূপ মর্মপীড়ার কারণ। বেশীর ভাগ শিক্ষিত মুসলিমানের মনে পশ্চিমা ধ্যানধারণাও এর কারণ। এ আধিপত্যের সূত্রপাত হয় বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণের কারণে। এ বুদ্ধিবৃত্তিক আক্রমণ মুসলমানদেরকে পশ্চিমাদের মুখোমুখী করে দিয়েছে।

এর জন্য পশ্চিমা সভ্যতার চেতনা এবং এর বুদ্ধিবৃত্তিক ও মননশীল ধারণার সাথে ইসলামের সাংঘর্ষিক অবস্থার সৃষ্টি করে। আরেকটি সমস্যা হলো *জিহাদের* উদ্দেশ্য ও এর যথার্থতা সম্পর্কে বুঝতে না পারা। মুসলমানগণ এটা বুঝতে পারে না যে, ইসলামকে জোর করে চাপিয়ে দেয়া যায় না বরং ইসলাম প্রচারে যে সব বাধা রয়েছে তা দূর করাই *জিহাদের* উদ্দেশ্য। সে জন্য প্রয়োজনে ইসলাম প্রচারে বাধা দানকারী রাজনৈতিক শক্তিকে দূর করতে হবে, না হয় ধ্বংস করে দিতে হবে যাতে মুসলিমগণ জয়ী হয়ে অমুসলমানদের নির্যাতনকে প্রতিহত করতে পারে।

জিহাদ ও মানুষের মধ্যে জোর করে ইসলাম প্রতিষ্ঠার বিষয়টি প্রথম দেখা যায় প্রাচ্যের ইতিহাসসমূহে। এ সব ইতিহাস অপপ্রচার আর মিথ্যা বর্ণনায় ভরপুর। সত্য ঘটনা বর্ণনায় এগুলো প্রচার করতে হবে। কুরআনে এ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষ স্বাধীনভাবে ধর্ম হিসাবে ইসলাম গ্রহণ করতে পারে বা ইচ্ছে করলে খ্রিস্টান ধর্ম বা ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করতে পারে। তারা কোন ইসলামী সমাজে থেকে বা ইসলামী রাষ্ট্রে থেকেও তাদের ধর্ম গ্রহণের এ স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। কুরআন ও সঠিক ঐতিহাসিক ঘটনাসমূহে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। ইসলামের কারণে বায়জেন্টাইন ও পার্সীয়ান আধিপত্যবাদীদের কবল থেকে মুক্তি পাওয়া মানুষ ইসলামের বিধানকে স্বাগত জানিয়েছে। মিশর ও সিরিয়ার খ্রিস্টানরা ইসলামের প্রদত্ত স্বাধীনতাকে স্বাগত জানায়। যদি ইসলামের এ ঘোষণা সত্য না হতো তা হলে মুসলিম সমাজে সংখ্যালঘুরা হারিয়ে যেত এবং সংখ্যালঘুরা আর বাঁচতে পারতো না। ইসলাম প্রচারের চৌদ্দশত বছরপরও সংখ্যালঘুরা যেভাবে বেঁচে আছে ইসলামের উদারতা না থাকলে তা সম্ভব হতো না।

ফুতাহাতকে আত্মরক্ষামূলক পন্থা হিসেবে উপস্থাপন করা অনুশোচনামূলক পদ্ধতি ছাড়া আর কিছু নয়। *ফুতাহাতের* এ অবস্থা কঠিন যুক্তির কাছে ধোপে টিকে না। আন্দালুশিয়া বা ট্রান্সঅক্সিয়ানার লোকেরা কি দেশ জয়ে মুসলিমদের দেশের সীমান্ত অতিক্রম করছে? সীমান্তে সুযোগ পেয়ে কি তারা এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকার দেশগুলোর গভীরে ঢুকে পড়তে পারে? এ সব দেশে আরব উপদ্বীপের দেশগুলোর চাইতেও অনেক ভয়াবহ ও চূড়ান্ত পর্যায়ের যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। এসব যুদ্ধের মধ্যে দক্ষিণ ফ্রান্সের পয়টারে ট্যুর-এর যুদ্ধ, ক্রিয়েট ও দক্ষিণ ইটালীর বিজয়, ট্রান্সঅক্সিয়ানায় তালাজ নদী তীরে তিরাজের যুদ্ধ, অবশেষে ভিয়েনা দখলের যুদ্ধের উল্লেখ করা যায়।

ফুতাহাতের আসল ব্যাখ্যা হলো *জিহাদের* মাধ্যমে ধর্মীয় দায়িত্ব পালন। রাসূল (সা) এ *জিহাদকে* ইসলামের শীর্ষ কাজ বলে অভিহিত করেছেন।

পাদটীকা :

১. *সাবাব আল নুযুলের* জন্য দেখুন, আহমদ ইবনে হাম্বল, *আল মুসনাদ* ৭/১২২। দেখুন আরো দেখুন : ইবন আল কাইয়্যুম।
২. *হাদীস*, সহীহ মুসলিম, ৩/১৩৫৭।
৩. মুসলিম, ইবনে আল হাজ্জাজ, *সহীহ*, ৩/১৫১৭।